সাম্রাজ্য হিসেবে মগধের উত্থানের কারণ।

প্রাচীন মগধ অবস্থিত ছিল বর্তমান দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলায়। এর সীমা ছিল উত্তরে গঙ্গা, পশ্চিমে শোন, পূর্বে চম্পা নদী ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের শাখা । অথর্ববেদে প্রথম মগধের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ ছিলেন মগধের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ ষোড়শ মহাজনপদের যুগে বিভিন্ন মহাজনপদগুলির মধ্যে। মগধ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। মগধের সাফল্যের পিছনে দুই ধরণের কারণ ছিল, মগধের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মগধের প্রতিপক্ষ মহাজনপদগুলির দুর্বলতা।

মগধের উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এর খনিজ সম্পদ। মগধের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রাজধানী ছিল রাজগীর। এখনো রাজগীরের চারদিক ঘন বনে আচ্ছন্ন। রাজগীর অঞ্চল তেমন উর্বরও নয়। তথাপি এই অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের যৌক্তিকতা কি ছিল তা অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় এখানকার লৌহ আকরিকের আস্তরণ খুব সহজেই উদ্ধারযোগ্য। তাছাড়া রাজগীরের অবস্থান ছিল গয়ার জঙ্গলের কাছে। এই অঞ্চলগুলিতে ছিল লোহা ও তামা এই দুইয়েরই বৃহত্তম ভারতীয় উৎস। সমকালে ক্ষমতার প্রধান উৎস ধাতুর (তামা ও লোহা) উপর মগধেরই ছিল প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। মগধের প্রখ্যাত কূটনীতিক চাণক্য খনির গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন 'রাজকোষ খনির উপর নির্ভরশীল, সেনাবাহিনী রাজকোষের উপর'।

মগধের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান এর উত্থানে সহায়ক হয়। মগধের প্রাকৃতিক সীমা ছিল সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। গঙ্গা, শোন আর চম্পা - এই তিনটি নদী দ্বারা মগধ পরিবেষ্টিত ছিল। ফলে শত্রুদের পক্ষে মগধ আক্রমণ করা সহজ ছিল না। প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা গিরিব্রজ (বর্তমান বিহারের পাটনা জেলায়)। বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি, বৈভার প্রভৃতি পাহাড় রাজগৃহকে বেষ্টন করে রেখেছিল। তাছাড়া প্রাকারবেষ্টিত রাজগৃহ নগরের চারদিকে নদী ও পরিখা ছিল। পরবর্তী রাজধানী পাটালিপুত্র ছিল শোন নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ও অত্যন্ত সুরক্ষিত।

মগধের কৃষি সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল মগধের ভূমির উর্ব্বরতা। এখানকার জমিতে বছরে দুবার ফসল ফলাতে দেখেছিলেন গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস। মগধের জমিকে উর্ব্বরা করার ক্ষেত্রে গঙ্গা নদীর একটা বড় ভূমিকা ছিল। রোমিলা থাপার লিখেছেন, ক্ষুদ্র জাতি ও যুদ্ধ বন্দী দাসদের সাহায্যে মগধ বিশাল অরণ্যভূমি উৎখাত করে কৃষিযোগ্য জমি তৈরিতে সক্ষম হয়। লোহার ভারী লাঙ্গল ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ফলে কৃষির উন্নতি ঘটে। কৃষির উন্নতির ফলে জনসাধারণের জীবনে সচ্ছলতা বাইরের মানুষকে মগধের দিকে আকৃষ্ট করে। বহু লোক মগধরাজ্যে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। ফলে মগধের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যা ছিল মগধের শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার জন্য মগধের সেনাদলে কখনও ঘাটতি দেখা দেয়নি। আবার শক্তিশালী সেনাদল ছিল মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তারের অন্যতম কারণ। তাছাড়া মগধের বনাঞ্চলের প্রচুর হাতি মগধের সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করেছিল।

মগধের অর্থনৈতিক শক্তি ছিল তার বাণিজ্যিক যোগাযোগ। মগধের ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ তিন দিকে নদী এই যোগাযোগে সহায়ক হয়। মগধের প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল এর পূর্বদিকে প্রবাহিত গঙ্গা নদী। গঙ্গাপথে কাশী পর্যন্ত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হত। অন্যদিকে যমুনা প্রবাহ ধরে বাণিজ্যতরী দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে যেত। অঙ্গ রাজ্য জয় করার পর চম্পা বন্দর মগধের অধিকারে আসে। এই বন্দর থেকে সমুদ্রপথে পণ্যবাহী বানিজ্যতরী যেত সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মদেশ, মালয়, দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে। ব্যাসামের মতে, গঙ্গার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই মগধ সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে। বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও অন্যান্য মগধ নৃপতিগণ চেয়েছিলেন গঙ্গাকে ‘মগধের নদী' তে পরিণত করতে। যাতে মগধ একাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে গঙ্গার বাণিজ্যপথ। এই বিষয়ে মগধ যথেষ্ট সফল হয়েছিল। বাণিজ্যের মাধ্যমে মগধের শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত ধনবান হয়ে ওঠে। এরা আবার ছিল মগধ রাজগণের ‘ব্যাঙ্কার'। যুদ্ধের সময় এরাই সরকারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত।

মগধ সামগ্রিকভাবে পূর্বতন সশস্ত্র উপজাতির পরিবর্তে উপজাতি-ভিত্তি বর্জিত এক নতুন ধরণের সেনাবাহিনী গঠন করে। এই বাহিনী অনুগত ছিল রাজার প্রতি। বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য একটি নতুন পদ তৈরী হয়, 'সেনাধ্যক্ষ'। যুবরাজগণই সাধারণত এই পদ পেতেন। নতুন ধরণের সেনাবাহিনী ছিল রাজার সর্বময় কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি। এছাড়া মগধের মাটির নীচে ছিল বিরাট লোহার খনি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে সামরিক শক্তির আকর। এই লোহার সাহায্যে উন্নত যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা হত। এই ধরণের উন্নত লৌহাস্ত্রের ব্যবহার সমসাময়িক অন্য কোনো ভারতীয় শক্তির জানা ছিল না। এরকম দুটি নতুন যুদ্ধাস্ত্র ছিল 'রথমুঘল' ও 'মহাশিলাকন্টক'।

মগধের যেসব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার উত্থানে সহায়ক হয়েছিল তার একটি প্রধান ছিল দেহ ও মনে উন্নত মগধের অধিবাসীবৃন্দ। মগধ ছিল মিশ্র জাতি ও সংস্কৃতির দেশ। আর্য ও অনার্য, সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র। এই সংস্কৃতি মগধের রাজাদের রাজ্যজয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। মগধ ছিল বহুকাল আর্য প্রভাবের বাইরে। ফলে কট্টর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসন এখানকার সমাজে প্রবেশ করেনি। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সার্বজনীন আবেদন মগধের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিণত করেছিল। ড. এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, একটি দেশের জীবনীশক্তি ও উত্থানের পিছনে কাজ করে সেই দেশের জনগনের দৃঢ় চরিত্র ও সুগঠিত দেহ। মগধের জনগণ এই দুটি গুণেরই অধিকারী ছিলেন।

মগধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছাড়া যে কারণটি তার সাম্রাজিক্য ক্ষুধা চরিতার্থ করতে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল তা হল অন্য মহাজনপদগুলির দুর্বলতা। মগধের মতো প্রাকৃতিক সুরক্ষা অন্য মহাজনপদগুলির ছিল না। কৃষিজ, বনজ, খনিজ সম্পদে মগধের সমকক্ষ অন্য কোনো মহাজনপদ ছিল না। ধারাবাহিকভাবে সুযোগ্য রাজার শাসন মগধের মত অন্য কোনো মহাজনপদে ছিল না। মগধ শুধু কয়েকজন শক্তিশালী শাসক পায়নি (বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মহাপদ্মা নন্দ) পেয়েছিল কয়েকজন দক্ষ প্রশাসক (বসসাকর ও কৌটিল্য)। সর্বোপরি মহাজনপদগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। সুতরাং মগধ তার নিজস্ব শক্তি ও প্রতিপক্ষের দুর্বলতার কারণে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়।